এসএসসি পরীক্ষার ফল ও কয়েকটি প্রশ্ন

মাছুম বিল্লাহ

১৬ মে, ২০২৪ ০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গত ১২ মে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথা অনুযায়ী ফল প্রকাশ করেছেন। এটি আমাদের দেশে আলাদা একটি গুরুত্ব বহন করে। পৃথিবীর সব দেশেই পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সরকারের প্রধান নির্বাহীর কোনো ভূমিকা সেখানে দেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের দেশে সরকারপ্রধান এই ফল প্রকাশ করেন এবং ফলের সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন, পরামর্শ দেন। অনেক বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে জানতে চান।

এবার এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাস করেছে ৮৩. ০৪ শতাংশ। এদের মধ্যে ছাত্রদের পাসের হার ৮১.৫৭ শতাংশ, ছাত্রীদের পাসের হার ৮৪.৪৭ শতাংশ।

ছেলেদের পাসের হার কম দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণও জানতে চেয়েছেন। দেশে সাক্ষরতার হার বেড়েছে, শিক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। মেয়েদের হার বেড়েছে অনেক। প্রাথমিকে একসময় ৫৪ শতাংশ ছাত্রী যেত, এখন ৯৮ শতাংশ যাচ্ছে।

মাত্র তিনটি বোর্ডে ছাত্রের সংখ্যা একটু বেশি, বেশির ভাগ জায়গায় ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। নারীশিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার ফল হচ্ছে এটি। এবার ১১টি বোর্ডে ছাত্র সংখ্যা ৯ লাখ ৯৯ হাজার ৩৬৪ জন আর ছাত্রী সংখ্যা ১০ লাখ ৩৮ হাজার ৭৮৬ জন। যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের প্রতি কোনো ধরনের নেতিবাচক আচরণ না করার জন্যও প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন।

মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ বছর ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ছিল ১৬ লাখ ছয় হাজার ৮৭৯ জন। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন দাখিল পরীক্ষা দিয়েছে মোট দুই লাখ ৪২ হাজার ৩১৪ জন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয় এক লাখ ২৬ হাজার ৩৭৩ জন। গত বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোট ২০ লাখ ৪১ হাজার ৪৫০ জন। গতবার পাসের হার ছিল ৮০.৩৯ শতাংশ। তার মানে হচ্ছে, ২০২৪ সালে পাসের হার বেড়েছে। ঢাকা বোর্ডে এবার পাসের হার ৮৯.৩২ শতাংশ, রাজশাহী বোর্ডে ৮৯.২৫ শতাংশ, কুমিল্লায় ৭৯.২৩ শতাংশ, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৮২.৮০ শতাংশ, বরিশালে ৮৯.১৩ শতাংশ, দিনাজপুরে ৭৮.৪০ শতাংশ এবং ময়মনসিংহে ৮৪.৯৭ শতাংশ। এবার যশোর বোর্ডে পাসের হার ৯২.৩২ শতাংশ আর সর্বনিম্ন সিলেট বোর্ডে, সেখানে পাসের হার ৭৩.৩৫ শতাংশ। এর কারণ কী? একই সিলেবাস, একই সময়ে পরীক্ষা, একই ধরনের শিক্ষক পড়িয়ে থাকেন, তাহলে কী কারণ কিংবা কী কী কারণে এক বোর্ড থেকে আরেক বোর্ডের ফলে এত বেশি পার্থক্য? আরো দেখা যাবে, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া বোর্ডটির ফল হয়তো পরবর্তী বছর হঠাত্ করে সবার ওপরে চলে যায়। আমাদের বোর্ডগুলো কি বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা করে? কারণ অনুসন্ধান করে কি জাতিকে জানানো উচিত নয়? তা না হলে বিষয়টি তো গুরুত্বহীন থেকে যাবে।

আরেকটি বিষয় প্রতিবছরই দেখা যেত যে মাদরাসা বোর্ড ফলের দিক থেকে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে এগিয়ে থাকত। এর পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণই নেই। এবার মাদরাসা বোর্ডে পাসের হার ৭৯.৬৬ শতাংশ, আর জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ১৪ হাজার ২০৬। কারিগরি বোর্ডে পাসের হার ৮১.৩৮ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাস-ফেল

আমাদের খুব একটা স্পষ্ট বার্তা দেয় না। এখানে বেশির ভাগই প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু এই ফল আমাদের কী বলে তার ব্যাখ্যা আমরা কোথাও দেখতে পাই না। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা যে পরিমাণ গুরুত্ব পাওয়ার কথা বর্তমান অবস্থা সেটি থেকে অনেক দূরে।

আরেকটি বিষয় আমরা প্রতিবছরই দেখি যে, কিছুসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করে না, গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৪৮টি, এবার দেখলাম ৫১টি; অর্থাত্ বেড়ে গেছে। তার মানে হচ্ছে পুরো অকৃতকার্যের বিষয় নিয়ে ফল প্রকাশের পর তা নিয়ে আলোচনা খুব একটা হয় না। আলোচনা হলে এ বিষয়টি বারবার দেখা যেত না। বোর্ড কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও খুব একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা আমরা শুনতে পাই না।

কোন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চসংখ্যক পাস, জিপিএ ৫ প্রাপ্তি ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্টতা ও অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং থাকা প্রয়োজন এবং এটি কোনো থার্ড পার্টি করলে ভালো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি কোনো বিভাগের করা ঠিক নয়। সরকারি, বেসরকারি, এমপিওভুক্ত, নন-এমপিওভুক্ত নির্বিশেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান র‍্যাংকিং থাকা প্রয়োজন। দেশে একটি র‍্যাংকিং পদ্ধতি থাকলে আমরা সহজে বুঝতে পারি বোর্ডগুলোর ফলাফলের সঙ্গে র‍্যাংকিং কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ। তা ছাড়া র‍্যাংকিং বিষয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে আর শিক্ষার জরুরি অথচ উপেক্ষিত উপাদান, যেমন–খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, আচার-আচরণ এগুলোর কোনো প্রতিফলন এসব ফলে দেখা যায় না, বোঝা যায় না–অথচ জীবনে চলতে, কাজ করতে এগুলোর খুব প্রয়োজন। নতুন কারিকুলামে এগুলো মূল্যায়নের বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানেও খুব আশাবাদী হতে পারছি না। কারণ বিষয়গুলো সেভাবে এগোচ্ছে না আর বাস্তবের চেয়ে উচ্চাশার প্রতিফলন বেশি দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান র‍্যাংকিং হলে এসব বিষয় চলে আসে এবং তখন বলা যায় কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সার্বিক শিক্ষা প্রদান করছে।

ইংরেজি ও গণিত মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারণ এ দুটি বিষয়ে একমাত্র কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকিগুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকই নেই। শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই এ দুটি বিষয়ের দুর্বলতা নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পার করে। অথচ পাবলিক পরীক্ষা পাসের হারে কোনো এক জাদুর পরশে দেখা যায় এ দুটো বিষয়ে পাসের হার আকাশছোঁয়া। এবার ঢাকা বোর্ডে ইংরেজিতে পাসের হার ৯৪.৫৮ শতাংশ, গণিতে ৮৮ শতাংশ।

পাসের হারে এগিয়ে থাকা যশোর বোর্ডে ইংরেজিতে পাসের হার ৯৬ শতাংশ আর গণিতে ৯৮.৫৫ শতাংশ। এই ফলও আমাদের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ও গণিতের প্রকৃত দক্ষতা তুলে ধরছে কি না, সেটি একটি প্রশ্ন।

আমাদের শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল, তারা দেশের বাইরে গিয়ে কিংবা দেশেও বিভিন্নভাবে তাদের মেধা ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে অথচ তাদের সিস্টেমেটিক্যালি দুর্বল মূল্যায়নের দিক দিয়ে যেতে হয় আর তাদের ফল নিয়ে তাই অনেকেই প্রশ্ন তোলে। বিষয়টিতে নজর দেওয়া একান্ত জরুরি। শিক্ষাক্ষেত্রে বোর্ডগুলোর ভূমিকা কী দেখি? শুধু পরীক্ষার ফরম পূরণ করা আর পরীক্ষার ফল দেওয়ার মধ্যেই তাদের বেশির ভাগ সময় চলে যায়। শিক্ষার মানোন্নয়নে বোর্ড কী ধরনের ভূমিকা রাখে বা রেখে চলেছে সে বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই। শিক্ষা বোর্ড কি কখনো বিষয় শিক্ষক কিংবা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে শিক্ষা প্রশাসন কিংবা বিষয়ভিত্তিক মানোন্নয়নের জন্য বছরে দু-একটি কার্যকর ওয়ার্কশপ কিংবা সেমিনারের আয়োজন করে, যেখানে দেশের শিক্ষাবিদদের সঙ্গে শিক্ষকদের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা থাকে? এ রকম তো খুব একটা দেখা যায় না। বোর্ডে খাতা আনার সময় দেখতাম, পরীক্ষকদের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর কিভাবে লিখতে হবে, কিভাবে লিখলে কত নম্বর দেওয়া হবে–এসব নিয়ে মতবিরোধ চলতে থাকত। এখনো নিশ্চয় আছে। ফলে শিক্ষকরা যাঁর যাঁর মতো করে নম্বর দিয়ে থাকেন। ইউনিফর্ম কোনো নিয়ম মেনে অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় না। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরীক্ষার ফল বের হলে চেয়ারম্যানারা অনেক ধরনের ব্যাখ্যা ও আশার কথা শুনিয়ে থাকেন। এটি বাস্তবে কতটা সম্ভব কিংবা এ ধরনের সংস্কৃতি আমরা তৈরি করতে পেরেছি কি না, সেটিও বিবেচনার বিষয়।

লেখক : শিক্ষা গবেষক এবং সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর, ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ

masumbillah65@gmail.com